পাণিনীয় রূপতত্ত্ব ও অখণ্ড রূপতত্ত্ব

শিশির ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১. উপক্রমণিকা

'অথ শব্দানুশাসনম্' – পাণিনির ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী' শুরু হয়েছে এই দু'টি কথা দিয়ে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে শব্দের গঠন ও শব্দের সঠিক ব্যবহারের অনুশাসন বা নিয়মকেই প্রাচীন ভারতে 'ব্যাকরণ' বলে মনে করা হতো। বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়: শব্দগঠন পদ্ধতি যাকে আধুনিক যুগে আমরা 'রূপতত্ত্ব' নামে চিনি। প্রবন্ধের শুরুতে রূপতত্ত্বের প্রধান দুটি ঘরানার একটি, আণবিক ঘরানার কর্মপদ্ধতি, এর বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে। এরপর অখণ্ড রূপতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা উপস্থাপন করা হবে এবং বিভিন্ন ভাষার শব্দের উদাহরণের আলোকে শব্দের গঠন বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে অখণ্ড রূপতত্ত্বের মডেলটি ব্যাখ্যা করা হবে। উপসংহারে বলা হবে, আণবিক ও অখণ্ড – রূপতত্ত্বের এই দুই ধরনের মডেলের মধ্যে কোন বিশেষ মডেল বা কোন ধরনের মডেল শব্দগঠন বর্ণনা ও ব্যাখ্যার কাজে অধিকতর গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

২. রূপতত্ত্বের আণবিক মডেল ও এর সীমাবদ্ধতা

ভারতবর্ষের বৈয়াকরণেরা মনে করতেন, শব্দগঠনের একাধিক পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে দুই বা ততোধিক প্রণব (Phoneme) বিশেষ পরম্পরায় মিলিত হয়ে তৈরি হয় শব্দের চেয়ে ছোট কিছু বস্তু বা অনুবস্তু: ধাতু, প্রত্যয়, উপসর্গ ও বিভক্তি।[১] দ্বিতীয় পর্যায়ে শব্দাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এই বস্তুগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গঠিত হয় এক একটি শব্দ। কিভাবে এই সংযোজনের কাজটা সংঘটিত হয় তা বিচার-বিশ্লেষণ করাটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের বৈয়াকরণদের মতে 'শব্দানুশাসন' বা ব্যাকরণের অন্যতম প্রধান কাজ। শব্দ কেমন করে তৈরি হয় তা বিচার করে দেখা হয় যে শাস্ত্রে, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে তার নাম রূপতত্ত্ব। ইদানিংকালে রূপতত্ত্বের সংজ্ঞায় আরও পরিবর্তন এসেছে। ভাষাবিজ্ঞানের চমস্কি-পরবর্তী যুগে ব্যাকরণকে দেখা হয় মানবমস্তিষ্কের একটি মডিউল হিসেবে। চমস্কির দাবি: মানুষের মস্তিষ্কে আছে একটি ভাষা-অঙ্গ বা ব্যাকরণ মডিউল। তাই যদি হয়, তবে রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব হবে সেই ব্যাকরণ মডিউলের এক একটি সাব-মডিউল বা উপাঙ্গ। এদিক থেকে দেখলে রূপতত্ত্বের কাজ হবে তিনটি:

১. নতুন শব্দ গঠন করা,
২. ভুলে যাওয়া শব্দ স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং
৩. নতুন শব্দ বুঝতে সাহায্য করা

একজন বাংলাভাষীর রূপতাত্ত্বিক মডিউলে কেমন করে সম্পন্ন হয় এই তিনটি কাজ ? এই প্রশ্নটির উত্তর রূপতত্ত্বের এক এক মডেল এক এক ভাবে দেয়। বর্তমানে রূপতত্ত্বের যত রকম মডেল প্রচলিত আছে সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: **১.আণবিকবাদী** (Atomistic); ২. **অখণ্ডবাদী** (Holistic)। আণবিকবাদীদের মতে ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে: Divide and Rule! শব্দকে যত পারো ব্যবচ্ছেদ করে আবিষ্কার করো একাধিক অনুবস্তু সহযোগে ('অণু' থেকে 'আণবিক') শব্দের আন্তর্গঠনের নিয়ম। যদি প্রশ্ন করা হয়: 'শব্দকোষে (Lexicon) কি ধরনের বস্তু রয়েছে?', তবে আণবিকবাদীরা বলবেন, শব্দকোষে রয়েছে ধাতু, প্রাতিপদিক, অঙ্গ, শব্দ, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ এবং (Jackendoff, 1975 এর মতে) 'পটল তোলা' বা 'যাও পাখি বল তারে' ধরনের বাক্যাংশ। অখণ্ডবাদীরা মনে করেন, শব্দের চেয়ে ছোট কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই শব্দকোষ বা অন্য কোথাও। শব্দ অখণ্ড, অটুট। এঁদের মত হচ্ছে : ধাতু, প্রত্যয়, বিভক্তি ... রূপতত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য এসব ক্যাটাগরির কোন প্রয়োজনই নেই। ভর্তৃহরিকে অনুসরণ করে (The word has no division... But the ignorant person sees division through artificial splitting. (Bhartrihari, *Vakyapadiyam*, 2:13, Tr. by Iyer K.A.S.,1997:6)) এঁরা দাবি করেন যে শব্দের কোন আন্তর্গঠনই থাকতে পারে না। পাণিনি (খ্রী.পূ. ৬০০) থেকে শুরু করে Chomsky (১৯৭০), Halle (১৯৭২), Vennemann (১৯৭৪), Jackendoff (১৯৭৫), Aronoff (১৯৭৬), Kiparsky (১৯৮২), Sadock (১৯৮০), Siegel (১৯৭৯), Corbin (১৯৮৭), Anderson (১৯৯২)... পর্যন্ত আধুনিক রূপতাত্ত্বিকদের প্রায় সবাই আণবিকবাদী। রূপতত্ত্বের জগতে খাঁটি অখণ্ডবাদীরা সংখ্যালঘু। অতীতে ছিলেন ভর্তৃহরি, আর আধুনিক কালে ছিলেন Alan Ford ও Rajendra Singh (১৯৯৭)।

আণবিকবাদী আর অখণ্ডবাদী – এই উভয় নৌকায় সওয়ার Aronoff (১৯৭৬) আর Anderson (১৯৯২)। অখণ্ডবাদীদের মতো এঁরাও স্বীকার করেন যে শব্দকোষে শব্দাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তবে এ ধরনের বস্তু যে একেবারে কোথাও নেই তা তাঁরা মানতে রাজি নন। এঁদের মতে উপসর্গ, প্রত্যয়, ইত্যাদি বস্তু শব্দগঠন সূত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

শব্দগঠনসূত্র-১: বাঁদর$_{\text{বিশেষ্য}}$ → + (প্রত্যয়) আমি = বাঁদরামি$_{\text{বিশেষ্য}}$

শব্দগঠনসূত্র-২: go$_{\text{Verb, 2nd person, Present}}$ → + (ক্রিয়াবিভক্তি) z = goes$_{\text{Verb, 3rd person, Present}}$

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বিনয়$_{\text{বিশেষ্য}}$ → + (প্রত্যয়) ইত = *বিনয়িত$_{\text{বিশেষণ}}$। (কোন ধ্বনিক্রমের বামদিকে * তারকাচিহ্ন দেবার অর্থ হচ্ছে ধ্বনিক্রমটি ভাষিক বস্তু হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়)। অথচ আমরা জানি, গ্রহণযোগ্য শব্দ হচ্ছে 'বিনীত।[২] এ ধরনের সমস্যা হলে Aronoff (১৯৭৬) বলবেন: কিছু কিছু শব্দে -ইত প্রত্যয় যুক্ত হবার আগে (য়-লোপ সূত্র) কার্যকর হবে।

শব্দগঠনসূত্র-৩: বিনয়$_{\text{বিশেষ্য}}$ → (য়-লোপ সূত্র) → বিন + ইত = বিনীত$_{\text{বিশেষণ}}$

পরাজয়$_{\text{বিশেষ্য}}$ → (য়-লোপ সূত্র) → পরাজ + ইত = পরাজিত$_{\text{বিশেষণ}}$

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে (য়-লোপ সূত্র) প্রয়োগ করলে বরং শব্দসাধন বিঘ্নিত হয়:

ক্ষয়$_{\text{বিশেষ্য}}$ → (য়-লোপ সূত্র) ক্ষ → + ইত = *ক্ষিত$_{\text{বিশেষণ}}$

অথচ, ভয়$_{\text{বিশেষ্য}}$ → (য়-লোপ সূত্র) ভ → + ইত = ভীত$_{\text{বিশেষণ}}$

এ ধরনের ক্ষেত্রে Aronoff বলবেন, অমুক অমুক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে য়-লোপ সূত্র প্রয়োগ করা চলবে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কোন শব্দগুলোতে য়-লোপ সূত্র কার্যকর হবে আর কোন কোন শব্দে হবে না – এ তথ্যগুলো জানা থাকার মানে হচ্ছে সেই শব্দগুলো সার্বক্ষণিকভাবে বক্তা বা শ্রোতার তাৎক্ষণিক স্মৃতিতে থাকা। যদি আগেভাগেই 'ভীত', 'ক্ষয়িত' বা 'বিনীত' এর মতো প্রত্যয়ান্ত শব্দ বক্তার স্মৃতিতে থাকে তবে সে শব্দগুলো গঠন করার প্রশ্নই আসে না। স্মৃতিই যদি সব শব্দের যোগান দেয় তবে রূপতত্ত্বের প্রয়োজনটা কি? এ ধরনের সমস্যা সব ধরনের আণবিক ব্যাকরণে রয়েছে, এমনকি অষ্টাধ্যায়ীরও একেবারে প্রথমেই এ রকম কিছু সূত্রের দেখা মিলবে।

সূত্র ১.১.১.: বৃদ্ধিঃ আটৈচ;
সূত্র ১.১.২.: আটেং গুণাঃ
সূত্র ১.১.৩.: ইকো গুণাবৃদ্ধী

উপরের সূত্রগুলো 'গুন' ও 'বৃদ্ধি' সূত্র নামে পরিচিত। সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা হচ্ছে: বিশেষ বিশেষ প্রতিবেশে 'ইক' নামে পরিচিত ৪টি স্বরধ্বনি: ই, উ, ঋ, ৯ বৃদ্ধিসূত্র ১.১.১. এবং গুণসূত্র ১.১.২ অনুযায়ী প্রতিস্থাপিত হবে। উদাহরণ: দিন+ষ্ণিক = দৈনিক; ভূত+ষ্ণিক = ভৌতিক। কিন্তু ১.১.৩. সূত্রটির ব্যতিক্রম রয়েছে:

১.১.৪. ন ধাতুলোপে আর্ধধাতুকে

অষ্ট্যাধায়ীতে 'আর্ধধাতুক' হচ্ছে এক ধরনের ভাঙা প্রত্যয় বা প্রত্যয়ের ভগ্নাংশ (দ্র. সূত্র: ৩.৪.১১৪)। সূত্র ১.১.৪.অনুসারে আর্ধধাতুক বিভক্তি যুক্ত হয় এমন সব ধাতুর ক্ষেত্রে ১.১.৩. সূত্র কার্যকর হবে না। ১.১.৫. সূত্রে পাণিনি অন্য একটি ব্যতিক্রমের কথা বলেছেন। আবার ১.১.৬. সূত্রে তিনি বলেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে ১.১.৪. এর ব্যতিক্রমগুলো কার্যকর হবে না। নিচের উদাহরণে দ্বিরুক্ত উপসর্গ হওয়ার কথা ছিল 'লু'। কিন্তু সূত্র ১.১.৩. কার্যকর হওয়ার কারণে 'লু' পরিণত হয়েছে 'লো'-তে। √লূঙ ধাতুর দীর্ঘ ঊ একই সূত্র অনুসারে ঔ-তে পরিণত হবার কথা ছিল। কিন্তু অর্ধধাতুক অচ্ এর উপস্থিতির কারণে তা হতে পারেনি। অচ্ এর উপস্থিতিতে -য়ণ প্রত্যয় শূন্য বিভক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে; √লূঙ এর দীর্ঘ ঊ প্রতিস্থাপিত হয়েছে হ্রস্ব উ দিয়ে।

লো+ √লূঙ + য়ণ + অ(চ) = লোলুঅ > লোলুভ (বাংলা 'লোলুপ'?)

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর আলোকে কিভাবে গঠিত হবে 'বিনয়' থেকে 'বিনীত'? 'মামা' থেকে 'মামী'? 'ছাত্র' থেকে 'ছাত্রী'ইবা তৈরি হয় কেমন করে? বিন, পরাজ, মাম্ বা ছাত্র্ ইত্যাদি উপাদান কোন ধাতু বা শব্দ নয় যে এগুলোর সঙ্গে -ই, -ইত বা -ও প্রত্যয় যুক্ত হবে। তাহলে 'ছাত্র' আর 'ছাত্রী''র মধ্যে যে রূপগত সম্পর্ক তা ব্যাখ্যা করা যাবে কিভাবে? এছাড়া অন্য একটি সমস্যা হচ্ছে, কোনো কোনো শব্দগঠনের ক্ষেত্রে উপসর্গ আর প্রত্যয় একসঙ্গে যুক্ত হয়। একটি যুক্ত না হলে অন্যটি যুক্ত হতে পারে না (ক্রিয়াবিশেষণ

হিসেবে *'সপরিবার' গ্রহণযোগ্য নয়)।

/পরিবার/$_{\text{বিশেষ্য}}$ → (স +) পরিবার (+ এ) = /সপরিবারে/$_{\text{ক্রিয়াবিশেষণ}}$

/heart/$_{\text{Noun}}$ → (dis+) heart (+ en) = /dishearten/$_{\text{Verb}}$

এ প্রসঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের কথাটাও বলতে হবে, কারণ ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা ছাড়া রূপতত্ত্বের যে কোন আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ধ্বনিতত্ত্বের বেশির ভাগ মডেলে দাবি করা হয় যে শব্দের দুটি স্তর আছে : অন্তর্লীণ স্তর (Underlying structure) এবং ভূমিস্তর (Surface structure)। কোন ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব হচ্ছে:

ক) সেই ভাষার সবগুলো প্রাণবিক বর্ণমালা (Phonemic alphabet) এবং

খ) শব্দ/অক্ষরের বিভিন্ন অবস্থানে অন্তর্লীণ স্তর থেকে ভূমিস্তরে উত্তরণের সময় শব্দের ধ্বনি-কাঠামোতে আসা পরিবর্তন।

অন্তর্লীণ স্তর থেকে ভূমিস্তরে উত্তরণের সময় শব্দের ধ্বনি-কাঠামোতে যে পরিবর্তন আসে তাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে:

১. স্বয়ংক্রিয়/সার্বভৌম (Automatic/Context-independent/Across the board) **পরিবর্তন:**

ক) অন্তর্লীণ স্তর: বাঘ → ভূমিস্তর বাগ (ঘ ~ গ)

খ) অন্তর্লীণ স্তর: {গোলাপ}+{জল} → ভূমিস্তর: /গোলাবজল/ (উচ্চারনানুগ বানান) (প ~ ব); {হাত}+{ঘরি} → ভূমিস্তর: /হাদঘড়ি/ (উচ্চারনানুগ বানান) (ত ~ দ)

২. প্রতিবেশ-নির্ভর (Context-sensitive) **পরিবর্তন :**

ক) (দিন + ষ্ণিক/ইক = 'দৈনিক') (ই ~ ঐ)। কিন্তু মীন + ইক = *'মৈনিক' (অন্তত বাংলায়) হয় না।

খ) দেহ + ইক = 'দৈহিক' হয় কিন্তু স্নেহ+ ইক = 'স্নৈহিক' বা পেট+ ইক = *'পৈটিক' হয় না।

গ) অ+আ = আ। মধ্য+আকাশ = 'মধ্যাকাশ'। কিন্তু ছাত্র + আন্দোলন = *'ছাত্রান্দোলন' ('ছাত্র-আন্দোলন' গ্রহণযোগ্য);

ঘ) আ+আ = আ। উদাহরণ: বিদ্যা+আলয় = 'বিদ্যালয়'। কিন্তু ভাষা + আন্দোলন = *'ভাষান্দোলন' ('ভাষা-আন্দোলন' গ্রহণযোগ্য)

প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস ছাড়া-নেওয়ার কাজটা যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে তেমনি ক) অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় রাখা সহজ নয়, এবং খ) যদি কোনো বাংলা শব্দে বা শব্দক্রমে কোনো অঘোষ ধ্বনি কোনো ঘোষধ্বনির পূর্ববর্তী হয় তবে সে অঘোষ ধ্বনিটি অবশ্যই ঘোষতা প্রাপ্ত হয় (উদাহরণ ১খ)। ১ক ও ১খ পরিবর্তনগুলো সার্বভৌম, কারণ প্রতিবেশ-নির্বিশেষে এগুলো কার্যকর হয়। পাণিনীয় ব্যাকরণে ধ্বনির যে সব পরিবর্তনকে 'সন্ধি' বলা হয়ে থাকে ১ক-খ পরিবর্তনগুলোও তার মধ্যে পড়ে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে সন্ধি দুই ধরনের আছে: ক) এক ধরনের সন্ধির (অ+আ = আ বা আ+আ=আ) ব্যতিক্রম আছে আর খ) অন্য এক ধরনের সন্ধির ব্যতিক্রম নেই। শব্দগঠনে সন্ধির ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রশ্ন হতে পারে: সংস্কৃত বা বাংলা ব্যাকরণে এই দুই ধরনের সন্ধিকে কি সমদৃষ্টিতে দেখা হবে? সন্ধির এই দুই ধরনের নিয়ম ব্যাকরণের কোন মডিউলের অংশ হবে: ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) নাকি রূপতত্ত্ব (Morphology) নাকি রূপধ্বনিতত্ত্ব (Morphophonology)।

এর উত্তরে আণবিকবাদীরা বলেন, ধ্বনিতত্ত্বে দুই ধরনের নিয়ম আছে: ১. কিছু নিয়ম আছে যেগুলোর কোন ব্যতিক্রম নেই। ২. আর এমন কিছু নিয়মও আছে যেগুলোর অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম থাকতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের নিয়মগুলো আভিধানিক ধ্বনিতত্ত্ব (Lexical phonology) বা রূপধ্বনিতত্ত্বের অংশ হবে। মোটকথা, যে সব ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, আণবিকবাদীরা সেগুলোকেও ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম হিসেবে বিবেচনা করতে চান। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের ফলে সূত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে (কারণ, প্রতিটি ব্যতিক্রমের জন্য নতুন সূত্র রচনা করতে হয়), ব্যাকরণ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে ওঠে, তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা কমে যায়। এ প্রসঙ্গে চতুর্দশ দশকের দার্শনিক উইলিয়াম অব ওকামের বক্তব্য স্মর্তব্য:বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবে ক্ষুরের মতো; ক্ষুর যেমন হালকা-পাতলা হলে তার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি তত্ত্বকেও অনর্থক জটিলতা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে হবে।

৩. অখণ্ড রূপতত্ত্ব

১৯৯০ এর দশকে কানাডার মন্ট্রিয়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক রাজেন্দ্র সিংহ আর অ্যালান ফোর্ড Whole Word Morphology (WWM) নামে শব্দগঠনের নতুন একটি মডেল উপস্থাপন করেন।[৩] অ্যালান ফোর্ড ও রাজেন্দ্র সিংহের (১৯৯৭,

২০০০) মতে যে কোন ভাষার রূপতত্ত্বকে একটি মাত্র সূত্র দিয়ে বর্ণনা করা যেতে পারে: $/X/_{\alpha} \leftrightarrow /X'/_{\beta}$

এই সূত্রে

ক. $X/_{\alpha}$ আর $/X'/_{\beta}$ হচ্ছে শব্দ;

খ. $'$ হচ্ছে /X/ আর /X'/ এর মধ্যে যাবতীয় রূপগত পার্থক্যের প্রতীক;

গ. α আর β হচ্ছে শব্দের দু'টি আলাদা ক্যাটাগরি বা পদ;

ঘ. দ্বিমুখী তীর $\leftrightarrow$ এর অর্থ হচ্ছে দুই দিক থেকে শব্দগঠনের কাজ চলতে পারে। যদি /X/ থাকে, তবে /X'/ও থাকবে এবং /X'/ থাকলে /X/;

ঙ. $X/_{\alpha}$ এবং $/X'/_{\beta}$ এর মধ্যে আর্থ সম্পর্ক থাকবে;

চ. /X'/এর মান শূন্য হতে পারে যদি $\alpha \neq \beta$ হয় অর্থাৎ α ও β আলাদা হয়।

একই রূপগত আর পদগত পার্থক্য প্রদর্শন করে এমন কমপক্ষে দুই জোড়া (অনেকক্ষেত্রে দুই জোড়া যথেষ্ট নাও হতে পারে) শব্দ যদি থাকে কোন ভাষাভাষীর শব্দকোষে এবং যদি সেই শব্দজোড়ের দুই সদস্য অর্থগতভাবে সম্পর্কিত হয় তবে সেই ভাষাভাষীর রূপতাত্ত্বিক মডিউলে একটি **রূপকৌশলের** (Morphological Strategy) সৃষ্টি হবে। নিচের **১**নং রূপকৌশলটির কথা ধরা যাক। কোন বাংলাভাষীর শব্দকোষে অর্থগতভাবে সম্পর্কিত এমন দুই জোড়া শব্দ যদি থাকে যেগুলোতে ক) বামদিকের শব্দটি হবে বিশেষ্য আর ডানদিকেরটি বিশেষণ, খ) প্রতিটি শব্দজোড়ের মধ্যে রূপগত পার্থক্যটি হচ্ছে –akto, তবে সেই বাংলাভাষীর রূপতাত্ত্বিক মডিউলে **১**নং রূপকৌশলটির জন্ম হবে।

১. $XC/_{\text{বিশেষ্য}} \leftrightarrow /XC\text{আক্ত}/_{\text{বিশেষণ}}$
বিষ $\leftrightarrow$ বিষাক্ত; কর্দম $\leftrightarrow$ কর্দমাক্ত

কোন শব্দকে যদি উপযুক্ত রূপকৌশলে প্রক্ষেপ বা ম্যাপ করা হয় তবে শব্দটি **পরিবর্তক** (Variable) ও **ধ্রুবক** (Constant) এই দুই উপাদানে (Subcomponent) বিশ্লেষিত হতে পারে। যে উপাদানটি পরির্তনশীল (কখনও বিষ- কখনও কর্দম-) সেটি 'পরিবর্তক' আর যে উপাদানটির কোনো পরিবর্তন নেই (-আক্ত) সেটি ধ্রুবক। অখণ্ডবাদীরা বলেন, শব্দের চেয়ে ছোট কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই শব্দকোষে। পরিবর্তক আর ধ্রুবক তাহলে কি? অখণ্ডবাদীদের উত্তর: পরিবর্তক বা ধ্রুবক নির্দিষ্ট কোন ক্যাটাগরি নয়। যে কোন প্রণব বা প্রণবপরম্পরা পরিবর্তক ও ধ্রুবক হিসেবে দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে যে কোন ভাষায় ধাতু, উপসর্গ, প্রত্যয় ইত্যাদির একটি নির্দিষ্ট তালিকা আছে এবং এসব ক্যাটাগরির সদস্যদের ধ্বনিগত কাঠামো সুনির্দিষ্ট, অর্থাৎ ক) যে কোন প্রণব-পরম্পরা ধাতু বা প্রত্যয় হতে পারে না, আবার খ) একই প্রণব-পরম্পরা কখনও ধাতু কখনও প্রত্যয় হতে পারে না। অথচ নিচের উদাহরণগুলোতে একই শব্দ 'মন্ত্রী' কোন রূপকৌশলে পরিবর্তক (২) আবার অন্য কোনো রূপকৌশলে (৩) হয়ে যাচ্ছে ধ্রুবক।[৪]

২. $/CX/_{\text{বিশেষ্য}} \leftrightarrow /\text{বন}CX/_{\text{বিশেষ্য}}$
মন্ত্রী $\leftrightarrow$ বনমন্ত্রী; বিড়াল $\leftrightarrow$ বনবিড়াল

৩. $/X/_{\text{বিশেষ্য}} \leftrightarrow /X\text{মন্ত্রী}/_{\text{বিশেষ্য}}$
মৎস্য $\leftrightarrow$ মৎস্যমন্ত্রী; বন $\leftrightarrow$ বনমন্ত্রী

৪. $/CX/_{\text{বিশেষ্য}} \leftrightarrow /\text{বনো}CX/_{\text{বিশেষ্য}}$
ফুল $\leftrightarrow$ বনফুল; দেবী $\leftrightarrow$ বনদেবী

আরও যে একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যেতে পারে সেটি হচ্ছে এই যে সাধিত শব্দের মতো সমাসান্ত শব্দগুলোও নির্দিষ্ট রূপকৌশল দিয়ে গঠন করা যেতে পারে। বেশির ভাগ শব্দকে কোন রূপকৌশলে প্রক্ষেপ করে ধ্রুবক আর পরিবর্তকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। প্রত্যয়ান্ত শব্দ 'কর্দমাক্ত' যেমন ধ্রুবক আর পরিবর্তকে বিশ্লেষিত হতে পারে তেমনি বিশ্লেষিত হতে পারে তথাকথিত সমাসান্ত শব্দ 'বনমন্ত্রী' আর 'বনফুল'। ৫নং উদাহরণে দেখা যাচ্ছে, দ্বিরুক্ত শব্দগুলোও রূপকৌশল দিয়ে গঠন করা যেতে পারে। সুতরাং, তথাকথিত সমাসবদ্ধ ও দ্বিরুক্ত শব্দগুলোকে দুটি আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে: ১. যে শব্দগুলো রূপতাত্ত্বিক নিয়মে গঠন করা যায় আর ২. যেগুলো রূপতত্ত্বের কোন প্রকার নিয়ম অনুসরণ করে গঠন করা যায় না। প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলো ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত কিনা তা পণ্ডিতেরা বিচার করে দেখবেন। এছাড়া প্রত্যয়ান্ত, সমাসান্ত, বা দ্বিরুক্ত শব্দগঠনের যাবতীয় কাজ যদি রূপকৌশলের মাধ্যমেই

করা যায় তবে ব্যাকরণে এ ব্যাপারগুলো আলাদা করে আলোচনা করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

৫. /Xa/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /XaXi/$_{\text{বিশেষ্য}}$
মারা ↔ মারামারি; কাড়া ↔ কাড়াকাড়ি

রূপতাত্ত্বিক উপাঙ্গে কোনো রূপকৌশল সৃষ্টি হতে হলে শব্দকোষে কমপক্ষে দু'টি শব্দজোড় থাকা চাই। কোনো শব্দ যদি কোন রূপকৌশলে ম্যাপ বা প্রক্ষেপ করা যায় তবে শব্দটি স্মরণ না থাকলেও চলতে পারে। যেমন, 'ধরাধরি' শব্দটি ভুলে গেলে ৫নং রূপকৌশল ব্যবহার করে শব্দটি স্মরণ করা যাবে। কিন্তু 'নাদুসনুদুস' বা 'খুঁটিনাটি'– এ ধরনের Hapax Legomenon বা 'সবেধন নীলমণি' শব্দ মনে করিয়ে দেবার জন্যে কোনো রূপকৌশল বাংলায় নেই। 'খুঁটি' আর 'খুঁটিনাটি''র মধ্যে যে রৌপপার্থক্য রয়েছে সেই একই রৌপপার্থক্য আছে এমন দ্বিতীয় শব্দজোড় নেই বাংলা শব্দকোষে। কোন বাংলাভাষী এসব শব্দ একবার ভুলে গেলে বাংলা রূপতত্ত্ব কোনভাবেই তাকে সাহায্য করতে পারবে না। এ রকম অসংখ্য শব্দ রয়েছে বাংলা শব্দকোষে: 'চক্ষুদান', 'ঘোড়ারোগ' বা 'কিংকর্তব্যকিমূঢ়' যেগুলো স্মরণ করার কোন রূপতাত্ত্বিক উপায় নেই।

পাণিনীয়দের সঙ্গে অখণ্ডবাদীদের একটি বড় পার্থক্য হচ্ছে এই যে পাণিনীয়রা দাবি করেন শব্দের গুরুত্বানুক্রমিক আন্তর্কাঠামো (Hierarchical Internal Structure) রয়েছে, যার মানে হচ্ছে, শব্দ অবশ্যই ক্ষুদ্রতর উপাদানে গঠিত এবং শব্দের অভ্যন্তরে এসব উপাদানের গুরুত্ব সমান নয়। 'বিষাক্ত' শব্দের 'বিষ' আর 'আক্ত' – এই দুই উপাদানের গুরুত্ব সমান নয়। লিবারের (১৯৯২) তত্ত্বে প্রত্যয় নির্বাচন করে প্রাতিপদিক বা অঙ্গকে, অর্থাৎ {আক্ত} নির্বাচন করবে 'বিষ' বা 'কর্দম'-কে, শেষোক্ত বস্তুদুটির সে ক্ষমতা নেই। অখণ্ডবাদীরা দাবি করেন, শব্দের কোন আন্তর্কাঠামো নেই, একটি শব্দের মধ্যে অন্য কোন শব্দ থাকতে পারে না। তাহলে কিভাবে 'বনমন্ত্রী' শব্দে দু'টি শব্দ রয়েছে: 'বন' আর 'মন্ত্রী'? এই প্রশ্নের উত্তরে অখণ্ডবাদীরা বলবেন, 'বন' শব্দ নয়, ধ্রুবক। ধ্রুবক 'বন' এর সঙ্গে নিয়মিত শব্দ 'বন' এর ধ্বনিগত মিল আছে বলে এটিকে শব্দ বলে ভ্রম হচেছ। কোন শব্দ যে মুহূর্ত থেকে কোন রূপকৌশলে ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে সে মুহূর্ত থেকে শব্দটি রূপতত্ত্বের প্রভাবে তার শব্দত্ব অর্থাৎ পদ, রূপ ও অর্থ হারাতে থাকে। (কালানুক্রমিক ব্যাকরণ-দুঃশাসন একে একে কেড়ে নেয় শব্দ-দ্রৌপদীর ১. পদ, ২. রূপ এবং ৩. অর্থ!)। 'বন' শব্দটি বিশেষ্য, কিন্তু 'বনমন্ত্রী' শব্দে 'বন' ব্যবহৃত হয়েছে অনেকটা 'মন্ত্রী' শব্দের প্রসারক (Modifier) বা বিশেষণ হিসেবে। 'বনফুল' শব্দে লক্ষ্য করুন, নিয়মিত শব্দ 'বন' ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে রূপগতভাবে বদলে গেছে: বন >বনো।

এটা ঠিক যে 'বন' বা 'বনো''র অর্থ এখনও কমবেশি অটুট আছে, কিন্তু এই অর্থ ও রূপ বিকৃত হওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। অনেক ধ্রুবক দেখে বোঝাই যায় না যে এগুলো কোন এককালে শব্দ ছিল। যেমন, ইংরেজি Friendly শব্দে ব্যবহৃত -ly প্রত্যয় দেখে বোঝার উপায় নেই এটি বহু কাল আগে একটি মুক্ত শব্দ lich (বা like) ছিল। এভাবে কালের প্রবাহে বহু নিয়মিত শব্দ তাদের শব্দত্ব হারিয়ে বৈয়াকরণিক রূপমূলে (আণবিক মতে) পরিণত হয়। বৈয়াকরণেরা এ ব্যাপারে একমত যে যাবতীয় বৈয়াকরণিক শব্দ বা নিপাতের উৎস কোন এক কালের নিয়মিত শব্দ। সংস্কৃতের অনেক উপসর্গ-প্রত্যয়-নিপাত বৈদিক ভাষায় নিয়মিত শব্দ ছিল। বাংলা অনুসর্গ 'সঙ্গে', 'দিয়ে', 'থেকে''র উৎপত্তি হয়েছে যথাক্রমে নামশব্দ 'সঙ্গ', ক্রিয়াশব্দ 'দেওয়া' এবং 'থাকা' থেকে। কালানুক্রমিক ব্যাকরণে এ প্রপঞ্চটির নাম **'বৈয়াকরণীভবন'** বা **'বৈয়াকরণীকরণ'** (Grammaticalization)।

কোন কোন সময় পরিবর্তক বা ধ্রুবকের সাথে ধাতু, শব্দ বা প্রত্যয়ের চেহারা টায়ে টায়ে মিলে যেতে পাওে, কিন্তু এ মিল একান্তই কাকতালীয়। ১নং রূপকৌশলে প্রক্ষেপ করা 'বিষাক্ত' শব্দের 'বিষ' অখণ্ডমতে পরিবর্তক আর আণবিক মতে এটিকে বলা হবে প্রাতিপদিক বা অঙ্গ; -আক্ত আণবিক মতে প্রত্যয় আর অখণ্ডমতে ধ্রুবক। কিন্তু ৬নং উদাহরণে 'বিন' বা 'পরাজ' ধাতু বা প্রাতিপদিক এই দুই ক্যাটাগরির কোনটিতেই পড়ে না। যদি এগুলো কোন ক্যাটাগরিতেই না পড়ে তবে কোন উপাদানের সঙ্গে {ইত} প্রত্যয় যুক্ত হচেছ?

৬. /Xঅয়/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /Xইত/$_{\text{বিশেষণ}}$
বিনয় ↔ বিনীত; পরাজয় ↔ পরাজিত; অপচয় ↔ অপচিত
(উৎস: 'অপচিত' শব্দটি ২৯/০৪/২০০৭ তারিখের দৈনিক সমকাল পত্রিকার উপসম্পাদকীয়তে ব্যবহৃত হয়েছে)

প্রতিটি রূপকৌশলে শব্দের রৌপ-পরিবর্তন সাধিত হয় এবং যে উপায়ে তা হয় তাকে বলা যেতে পারে রৌপ-কারিগরি (Morphological Mechanism)। রৌপ-পরিবর্তন সাধন (Morphological Operation) বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন,

৭ক. বিশেষ্য ~ বিশেষণ: স্বাধীনতা ↔ স্বাধীন
৭খ. বিশেষ্য$_{\text{কর্তৃকারক}}$ ~ বিশেষ্য$_{\text{অধিকরণ কারক}}$: গ্রাম ↔ গ্রামে

৭গ. ক্রিয়া$_{\text{মধ্যম পুরুষ, এক বচন, বর্তমান অনুজ্ঞা}}$ ~ ক্রিয়া $_{\text{নামপুরুষ, ঘটমান বর্তমান}}$: কর্ ↔ করছে

রৌপ কারিগরির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

ক. **সংযোজন-বিয়োজন** (Adjunction-Deletion)

৮ক. /XVC/$_{\text{বিশেষণ/বিশেষ্য}}$ ↔ /XCami/$_{\text{বিশেষ্য}}$
আঁতেল ↔ আঁতলামী; মাতাল ↔ মাতলামী

৮খ. /CX/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /বাকCX/$_{\text{বিশেষ্য}}$
দেবী ↔ বাগ্দেবী; শক্তি ↔ বাকশক্তি

খ. **প্রতিস্থাপন** (Substitution) (রূপকৌশল-৬: বিনয়↔বিনীত)

গ. **রূপসাম্য** (Identity):

৯. /X/$_{\text{পূর্বকালিক অসমাপিকা}}$ ↔ /X/$_{\text{সাধারণ বর্তমান, নাম পুরুষ}}$
করে ↔ করে; শুনে ↔ শুনে

ঘ. **আংশিক প্রতিস্থাপন** (Segmental Modification): /আশ/~/অস/

১০. /Xআশ/$_{\text{ক্রিয়া, অনুজ্ঞা, সাধারণ}}$ ↔ /Xঅস্ত/ $_{\text{ক্রিয়া, অনুজ্ঞা, প্রয়োজক}}$
সন্ত্রাস ↔ সন্ত্রস্ত; বিন্যাস ↔ বিন্যস্ত

১১. /CiC/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /COiCiK/$_{\text{বিশেষণ}}$
দিন ↔ দৈনিক; চীন ↔ চৈনিক

ঙ. **অনঙ্গ পরিবর্তন** (সুর ও শ্বাসাঘাতপরিবর্তন) (Supra-segmental modification)

১২. /CVC/$_{\text{Verb, Present}}$ ↔ /CV:C/ $_{\text{Verb, Past}}$
খাই ↔ খাআই; পাই ↔ পাআই
(১২ নং উদাহরণের শব্দজোড়গুলো চট্টগ্রামি ভাষা থেকে নেয়া হয়েছে)

লক্ষ্য করা যেতে পারে যে যাবতীয় প্রতিবেশ-নির্ভর পরিবর্তন (১০-১২) অখণ্ড মডেলে রূপকৌশলের অংশ। আণবিক ব্যাকরণে এই পরিবর্তনগুলো ধ্বনিতত্ত্ব, রূপধ্বনিতত্ত্ব বা আভিধানিক ধ্বনিতত্ত্বের অংশ।

কোন ভাষার সবগুলো রূপকৌশলের একটি তালিকা যদি করা যায় তবে সে তালিকাটি হবে সে ভাষার রূপতত্ত্বের বিবরণ। এই তালিকা তৈরি করার পর রূপকৌশলগুলোকে রৌপ-পরিবর্তন ও রৌপ-কারিগরির ধরণ অনুসারে সাজানো হলে বিভিন্ন শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে রূপকৌশলের সংখ্যা থেকে ঐ ভাষার রূপতত্ত্বের একটি প্রায় সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যেতে পারে (দ্রষ্টব্য: ভট্টাচার্য্য ২০০৭)

রূপতত্ত্ব কি অপরিহার্য? হ্যাঁ এবং না। ধরা যাক, 'মুঠোফোনে মিস কল পেয়ে কল ব্যাক করে যে' – এই অর্থে কোনো বাংলাভাষী একটি শব্দ তৈরি করলো: 'ব্যাক্‌কল'। শব্দটি বাংলা বা ইংরেজি– এই দুই ভাষার কোনটির রূপতত্ত্বের নিয়ম মেনেই তৈরি হয়নি।[৫] আবার তথাকথিত লোক-ব্যুৎপত্ত শব্দ 'সধবা', 'সকল্প' (বা 'স্বকল্প') বা 'চন্দ্রকম্প' নির্দিষ্ট রূপকৌশলে প্রক্ষেপিত হতে পারে। এর মানে হচ্ছে, শব্দগঠনকালে রূপতত্ত্ব ভাষাভাষীর কাজে আসতে পারে, কিন্তু কোনো সৃজনশীল লেখক বা কবি রূপতত্ত্বের সাহায্য না নিয়ে অন্য উপায়েও শব্দগঠন করতে পারেন।

১৩. /বিX/$_{\text{নঞর্থক বিশেষ্য}}$ ↔ /ʃ০X/$_{\text{সদর্থক বিশেষ্য}}$
বিদেশ ↔ স্বদেশ; বিধবা ↔ সধবা; বিকল্প ↔ সকল্প

১৪. /X/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /Xkɔmpo/$_{\text{বিশেষ্য}}$
ভূমি ↔ ভূমিকম্প; চন্দ্র ↔ চন্দ্রকম্প

রূপতত্ত্বের অন্য সব মডেলের মতো Word Formation rule ('শব্দনির্মাণ সূত্র') না বলে অখণ্ড রূপতত্ত্বে Word Formation Strategy ('রূপকৌশল' বা 'শব্দনির্মাণ কৌশল') কথাটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কারণ অখণ্ড রূপতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, কোন শব্দ যদি এমনিতেই কোন ভাষাভাষীর মনে থাকে তবে তা নতুন করে গঠন করার কোন প্রয়োজনই নেই। সূত্র আর কৌশলের মধ্যে তফাৎ আছে। না চাইতেই যা কার্যকর হয় তাই সূত্র। প্রয়োজনে যা কাজে লাগে তাই কৌশল।

৪. অখণ্ড রূপতত্ত্বের জন্য সমস্যা-সঙ্কুল কয়েকটি উদাহরণ

মহাভারতের বড় বড় বীর যেমন, ভীষ্ম বা দ্রোণ যুদ্ধের আগেই শত্রুকে নিজের মৃত্যুর উপায় বলে দিতেন। বিজ্ঞানের কোন তত্ত্বেও তেমনি আগেভাগে উল্লেখ থাকা উচিত কেমন করে সেই তত্ত্বটি ভুল প্রমাণ করা যাবে। যদি এ বিশেষ তথ্যটি দেওয়া না থাকে তবে তত্ত্বটিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলা যাবে না। মনে রাখা দরকার যে বিজ্ঞানের কোন তত্ত্বকেই সঠিক প্রমাণ করা যায় না, শুধু ভুল প্রমাণ (Refute বা Falsify) করা যায়। অখণ্ড রূপতত্ত্বের প্রবক্তারা দাবি করেছেন, শব্দের কোন গুরুত্বানুক্রমিক আন্তর্কাঠামো নেই। সুতরাং যদি কোন শব্দে একাধিক পরিবর্তকের উপস্থিতি প্রমাণ করা যায় তবে শব্দটি অখণ্ড রূপতত্ত্বের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করবে কারণ একাধিক পরিবর্তকের উপস্থিতির অর্থ হচ্ছে শব্দের আন্তর্কাঠামো আছে। বাংলায় এ ধরণের বেশ কয়েকটি শব্দ রয়েছে। নিচের 'পাঁচহাতি', চারগজী শব্দে দু'টি পরিবর্তক: ১. সংখ্যাশব্দ 'চার'/'পাঁচ' আর ২. পরিমাণবাচক শব্দ 'গজ'/'হাত'। 'পাঁচ বছর মেয়াদী' শব্দেও দু'টি পরিবর্তক: ১. 'পাঁচ' আর ২. 'বছর'।

১৬. /XC/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /YXCi/$_{\text{বিশেষণ}}$
হাত ↔ পাঁচহাতি; গজ ↔ চারগজী

১৭. /XC/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /YXCmeyadi/$_{\text{বিশেষণ}}$
বছর ↔ পাঁচ বছর মেয়াদী; দিন ↔ তিন দিন মেয়াদী

১৮. /X/$_{\text{সংখ্যাশব্দ}}$ ↔ /Xবছর-মেয়াদী/$_{\text{বিশেষণ}}$
পাঁচ ↔ পাঁচ বছর মেয়াদী; তিন ↔ তিন বছর মেয়াদী

'পাঁচ বছর মেয়াদী''র ক্ষেত্রে 'বছরমেয়াদী' একটি বিশেষণ (যেমন, 'বছরমেয়াদী চুক্তি') এবং এরকম দাবি করা অমূলক হবে না যে 'বছরমেয়াদী' ধ্বনিক্রমটি 'পাঁচবছর-মেয়াদী' শব্দে ধ্রুবক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এ শব্দে একটিই পরিবর্তক আছে: পাঁচ/তিন। 'পাঁচহাতি' বা 'চারগজী' জাতীয় শব্দগুলো অপেক্ষাকৃত সমস্যাসঙ্কুল। যেহেতু *'হাতি' বা *'গজি' বাংলা শব্দ নয় সেহেতু 'পাঁচহাতি' বা 'চারগজী' শব্দগুলো যথাক্রমে 'পাঁচ' ও 'হাত' এবং 'চার' ও 'গজ' প্রাতিপদিকদ্বয়ের এর সাথে ই-প্রত্যয় যুক্ত করে গঠিত হয়নি এমন দাবি ভুল প্রমাণ করা কঠিন।

১৯. /X/$_{\text{সংখ্যাশব্দ}}$ ↔ /Xহাতি/$_{\text{বিশেষণ}}$
পাঁচ ↔ পাঁচহাতি; ছয় ↔ দুইহাতি

২০. /X/$_{\text{সংখ্যাশব্দ}}$ ↔ / XC গজি/$_{\text{বিশেষণ}}$
পাঁচ ↔ পাঁচগজি; ছয় ↔ ছয়গজি

বলা বাহুল্য, এ ধরনের শব্দের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু কোন তত্ত্ব ভুল প্রমাণের জন্যে একটিমাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হতে পারে। সুতরাং এই ব্যতিক্রমী উদাহরণগুলো নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রকৃতিই হচ্ছে এমন যে এর প্রয়োগ-সংশোধন-বর্জন অবিরাম চলে। তত্ত্ব রচিত হবে, বাস্তবতার আলোকে তত্ত্বের সমস্যা নির্দেশ করা হবে এবং এর পর তত্ত্ব সংশোধন করা হবে বা বাতিল করা হবে।

৬. উপসংহার

যদিও বর্তমান প্রবন্ধে রূপতত্ত্বের অখণ্ড ঘরানার প্রতি লেখকের পক্ষপাত সুস্পষ্ট, তবুও এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য এটা দেখানো নয় যে আণবিক ঘরানার ব্যাকরণগুলো কোন কাজের নয়। বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই পাণিনি, Aronoff বা অন্যান্য আণবিকবাদী বৈয়াকরণেরা তাঁদের ব্যাকরণের সূত্রগুলো নির্মাণ করেছেন, সূত্রের ব্যতিক্রম নির্দেশ করেছেন এবং ব্যতিক্রমেরও কখন ব্যতিক্রম হবে তাও তাঁরা বলেছেন, তাঁরা আর্ষ প্রয়োগের কথাও উল্লেখ করেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে পাণিনি তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণটি রচনা করেছেন এবং বর্তমান যুগেও পৃথিবীর বেশির ভাগ বৈয়াকরণ সজ্ঞানে বা নিজের অজ্ঞাতসারে পাণিনির মডেলটিই কমবেশি অনুসরণ করছেন। কিন্তু বিজ্ঞানচর্চার সুনির্দিষ্ট পরম্পরা অনুসরণ করে আমরা রূপতত্ত্বের নতুন একটি মডেলের সন্ধান করেছি। সিংহ ও ফোর্ডের অখণ্ড রূপতত্ত্বের আলোকে বাংলা রূপতত্ত্বের একটি প্রায়-পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা (ভট্টাচার্য্য ২০০৭) দেবার পর আমাদের মনে এমত ধারণা জন্মেছে যে এ যাবৎকাল প্রচলিত বিভিন্ন আণবিক মডেলের তুলনায় সিংহ ও ফোর্ডের মডেলটি কোন মানব ভাষার বেশিরভাগ শব্দের গঠন অধিকতর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম।

টীকা

১. অষ্টাধ্যায়ীর সূচনায় আছে শিবসূত্র যাতে অ, ই, ক, ম, ইত্যাদির নাম দেওয়া হয়েছিল: 'বর্ণ'। বর্তমান আলোচনায় 'বর্ণ' শব্দটি প্রয়োগ করা সঠিক হবে না বিধায় আমি 'প্রণব' (Phoneme) শব্দটি ব্যবহার করেছি। অন্যান্য লেখকের রচনায় 'প্রণব' এর পরিবর্তে 'ধ্বনিমূল, 'ধ্বনিতা', 'স্বনিম', 'মূলধ্বনি' ইত্যাদি অধিশব্দ পাওয়া যাবে।

২. অনেকে বলতে পারেন, প্রাচীন কালের 'বিনয়িত' শব্দটি বিবর্তিত হয়ে থেকে বর্তমান যুগের বাংলায় 'বিনীত' হয়েছে। যেমন, সংস্কৃত 'অলাবু' থেকে বাংলায় হয়েছে 'লাউ'। কিন্তু এটা হচ্ছে, শব্দের Etymology বা ব্যুৎপত্তি বিচার যা কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের (Diachronic linguistics) বিষয়। ভাষার এককালিক ব্যাকরণে (Synchronic linguistics) ব্যুৎপত্তি কোন কাজে আসে না কারণ ক) 'অলাবু' থেকে 'লাউ' ব্যুৎপত্ত হয়েছে এই তথ্য জানা আছে – এমন বাঙালির সংখ্যা হাতে গোনা; খ) কোন বাংলাভাষী যদি কোন কারনে 'লাউ' শব্দটি একবার ভুলে যায় তবে সেটি পুনর্গঠন বা স্মরণ করার ক্ষেত্রে 'লাউ' এর ব্যুৎপত্তি তাকে সাহায্য করবে – এটি কষ্টকল্পনা। উল্লেখ্য যে, রূপতত্ত্ব আর ব্যুৎপত্তি-বিচার শাস্ত্রকে গুলিয়ে ফেলা কোনো ভাষাবিজ্ঞানীর জন্যে পেশাদার আচরণ হিসেবে বিবেচিত হয় না।

৩. অখণ্ড রূপতত্ত্বকে নতুন মনে হলেও শব্দকে ব্যবচ্ছেদ না করার দাবিটি যথেষ্ট প্রাচীন। এর শুরু অষ্টম শতকের ভর্তৃহরির হাতে বা তারও অনেক আগে গ্রীক-রোমান বৈয়াকরণদের হাতে। এর পর গত শতাব্দীর বিশের দশকে ফার্দিনঁ দ্য সোস্যুর (১৯১৫), ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩), ফেনোম্যান (১৯৭৪), জ্যাকেণ্ডফ (১৯৭৫), অ্যারোনফ (১৯৭৬), ড্রেসলার (১৯৮০) এন্ডারসন (১৯৯২) সহ আরও অনেক ভাষাবিজ্ঞানীর গবেষণার পরম্পরায় জন্ম নিয়েছে এই অখণ্ড রূপতত্ত্ব (দ্রষ্টব্য: ভট্টাচার্য্য ২০১৩)।

৪. কেউ বলতে পারেন, 'বনের দেবী' হয়, কিন্তু 'বনের মন্ত্রী' হয় না, বা 'বনমন্ত্রী' মানে 'বনের মন্ত্রী' নয়, 'বনমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী'। এ প্রশ্নের উত্তরে অখণ্ডবাদীরা বলবেন, বনের সাথে মন্ত্রীর কি সম্পর্ক হয়ে থাকে, বা মন্ত্রীমাত্রই যে কোন মন্ত্রণালয়েরই দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন – এসব ব্যাপার নির্ধারিত হবে সেমন্টিকস বা প্র্যাগম্যাটিকসে। মরফোলজির এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

৫. ২০০৭ সনের জুন-জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের মুখে এ শব্দটি শুনেছি। ব্যাসবাক্য অনুসারে শব্দটি হবে 'পূর্ব-পরপদলোপী মধ্যপদ-বিপর্যস্ত' (!) কর্মধারয় সমাস।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Anderson, S.R. (1992) *A-morphous morphology*. Cambridge University Press, Cambridge.

Aronoff, M. (1976) *Word formation in generative grammar.* MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Bhattacharja, S. (2007) *Word formation in Bengali: a Whole Word Morphological description and its theoretical implications*. Lincom Europa, Munchen

ভট্টাচার্য্য, শিশির (২০১৩) অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ। নবযুগ, ঢাকা।

Chomsky, N (1979) Remarks on Nominalization. In R.A. Jacobs and P.S. Rosenbaum (eds.) *Readings in English Transformational Grammar*. Waltham, MA/Ginn, 184-221.

Corbin, D. (1987) *Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique* (2 vols). Niemeyer, Tübingen.

Dressler, W.U. (1988) Preferences vs. strict universals in morphology: word-based rules. In M. Hammond and M. Noonan (eds.) *Theoretical morphology*, 143-154, Academic press, San Diego.

Ford, A., R. Singh and G. Martohardjono (1997) *Pace Panini, towards a word-based theory of morphology.* Peter Lang, New York.

Hai, M.A. (1964) *Dhvani vijnan o Bangla dvhani tattwa* (in Bengali). Mullick Brothers, Dacca.

Halle, M. (1973) Prolegomena to a theory of word-formation. *Linguistic Inquiry* 4: 3-16.

Iyer, K.A.S. (1997) *The vakyapadiya of Bhartrhari (*chapter-2). Motilal Banarsidass, Delhi.

Jackendoff, R. (1975) Morphological and semantic regularities in the lexicon. *Language* 51:639-71.
Katre, S. M. (1989) *Astadhayi of Panini*. Motilal Banarsidass, Delhi.
Kiparsky, P. (1982) Lexical morphology and phonology. In I. S. Yang (ed.) *Linguistic in the morning calm: selected papers from SICOL-1981*. The Linguistic Society of Korea & Hanshin Publishing Co., Seoul, pp. 3-91.
Lieber, R, (1992) *Deconstructing Morphology: Word formation in Syntactic Theory*. The University of Chicago Press, Chicago/London.
Mel'cuk, I. (1993) *Cours de morphology générale, vol-1 (Introduction et première partie: le mot).* Les Presses de l'Université de Montréal, CNRS Editions.
Sadock J.M. (1980) Noun incorporation in Greenlandic: A case of syntactic word-formation. *Language* 57: 300-319.
Saussure, F. de (1988) *Cours de linguistique générale.* Editon Payot, Paris (Originally published in 1915) (English Tr. Roy Harris (1986) *Course in general linguistics*, Open Court, Chicago).
Siegel, D. (1979) *Topics in English morphology.* Garland, New York.
Singh, R. and A. Ford (2000) In praise of Sakatayana: some remarks on whole word morphology. *The Yearbook of South Asian Languages and Linguistics 2000*:303-310.
Vennemann, T. (1974) Words and syllables in natural generative grammar. In A. Bruck et al. (eds.) *CLS Parasession on Natural Generative Phonology*, pp. 346-374.